আসায় কপ্টারের তোবড়ানো ককপিট থেকে পুলিস দু'জনকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল। দু'জনেরই কয়েকটা করে হাড় ভেঙেছে, হাত ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, তবে কারও আঘাতই এতটা গুরুতর নয় যে মারা যাবে।

গোটা ব্যাপারটা অমানবিক। ফকার পাইলটের এই আচরণের পিছনে যৌক্তিক কোন কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সে খুব ভাল করে জানে ট্রাইমোটর আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আকাশে টিকবে, কাজেই পুলিস হেলিকপ্টার দেখার পর ধাওয়া বাদ দিতে পারত। কপ্টারটাকে ফেলে দেয়ার পিছনে আত্মরক্ষার তাগিদ কাজ করেনি। ঠাণ্ডা মাথায় মজা লুটতে চেয়েছে লোকটা। ট্রাইমোটরকে আবার ধাওয়া শুরু করার আগে বিধ্বস্ত কপ্টারের দিকে ভাল করে একবার তাকালও না সে।

পিছনে কি ঘটছে রানা জানে না। ককপিটের সাইড উইন্ডো দিয়ে ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে ছিলেন খুরশিদা হক, তাই তিনি রোমহর্ষক দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। দেখে এমন ভয় পেলেন যে মুখ খোলার শক্তি পর্যন্ত নেই।

রানার সামনে ক্রিস্টোফার কলম্বাস, সত্তর ফুট উঁচু স্ট্যাচু। বাম ডানার নয় কি দশ ফুট তফাত দিয়ে পাশ কাটাল ওটাকে। বাঁক ঘুরে চলে এল সেন্ট্রাল পার্কের ওপর।

পার্কে হাজার হাজার মানুষ। গ্রীষ্মকালের উষ্ণ বিকেল উপভোগ করতে এসেছে সবাই। সব কিছু ভুলে মাথার ওপর অনুষ্ঠিত নাটকটা দেখছে তারা। গোটা শহর থেকে অসংখ্য পুলিস কার বিভিন্ন রাস্তা ধরে এই পার্কের দিকে ছুটে আসছে, পুরোদমে সাইরেন বাজিয়ে। ফিফথ অ্যাভিনিউ-এর দিক থেকে আরও কয়েকটা পুলিশ হেলিকপ্টারকে আসতে দেখা গেল, ওগুলোর পিছু নিয়েছে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের একঝাঁক কপ্টার।

'আবার হামলা করছে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন খুরশিদা হক। 'আটশো ফুট ওপর থেকে আমাদের লেজ লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে!'

রানা দিক বদলাতে পারে, প্রাণপণ চেষ্টা করলে কোন রকমে বাঁকও ঘুরতে পারে, কিন্তু এলিভেটর কাজ না করায় এক ফুট ওপরেও উঠতে পারবে না। ওর মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি হলো। এই প্ল্যান কাজে লাগবে শুধু লাল ফকার যদি গুলি করতে করতে ট্রাইমোটরের সরাসরি ওপর দিয়ে সামনের দিকে উড়ে যায়।

মিডল্ এঞ্জিনের ইগনিশন ও ফুয়েল সুইচ 'অন' পজিশনে রাখল রানা। তোবড়ানো এঞ্জিন খকখক করে কাশল বার কয়েক, তারপর আবার ঠিকমত ঘুরতে শুরু করল। এবার ডানদিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে, জানে পিশাচ পাইলট বজ্রের মত নেমে আসছে ওপর থেকে। এড়িয়ে যাবার অ্যাকশন মুহূর্তের জন্যে পাইলটকে হতচকিত করে তুলল, মেশিন গান থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের দুটো ধারা ফোর্ডের অনেকটা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফকারের পাইলট দ্রুত নিজের ভুল শুধরে আবার মেশিন গান চালাল। রানা অনুভব করল ওর ট্রাইমোটরের আপার উইং-এ আঘাত করছে বুলেট, ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে স্টারবোর্ড এঞ্জিনটাকে। এঞ্জিনের পিছনে উথলে উঠল কমলা শিখা, তবে ওটার সিলিন্ডারগুলো এখনও খুব জোরেই ঘুরছে। প্লেনটাকে মোচড় খাইয়ে ইউটার্ন নিল। আরও এক পশলা বুলেট ককপিটে ঢুকে কন্ট্রোল প্যানেল চুরমার

করে দিল। তবে এবার রানার পালা। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ও। ভাঙা উইন্ডশীল্ডের ওপর দিয়ে সগর্জনে সামনে ছুটে যাচ্ছে লাল ফকার।

তিনটে থ্রটলই সামনে ঠেলে দিল রানা। ওর দুটো এঞ্জিনের যা শক্তি, ফকারের স্পীডের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারবে। ওর মাঝখানের এঞ্জিনটা শুধু সিলিন্ডারের ওপর সচল থেকে ধোঁয়ার ঘন মেঘ আর তেল ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সবগুলো থ্রটল সামনে ঠেলতে যা দেরি, ট্রাইমোটর প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে কামানের গোলার মত ছুটল।

লাল ককপিটে বসা লোকটা অনেক দেরিতে লেদার হেলমেট পরা মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেল রূপালি ট্রাইমোটর শিকারি বাজপাখির মত তার বিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। দ্রুত ওপরে উঠতে গিয়ে তিন ডানার ডগায় খাড়া হয়ে গেল ফকার। তিন প্রস্থ ডানা নিয়ে নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এই ওপরে উঠতে যাওয়াটাই তার কাল হলো। ট্রাইমোটরের বড় একটা ল্যান্ডিং হুইল কাঠ ভেঙে, কাপড় ছিঁড়ে ওপরের উইংটাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

রানা শুধু দেখার সুযোগ পেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ফকার, এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ওটার পাইলট হাত তুলে ওকে দেখে নেয়ার ভঙ্গিতে শাসাচ্ছে। গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের মাথায় পড়তে যাচ্ছে প্লেনটা।

সেন্টার আর স্টারবোর্ড এঞ্জিন ট্রাইমোটরকে একটা জ্বলন্ত মশালে পরিণত করার আগে ওগুলো বন্ধ করে দিল রানা। প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কিন্তু আহত ঘোড়ার মত, যে কখনও সামনে ছুটতে দ্বিধা করেনি, পুরানো যান্ত্রিক পাখিটাও বাতাস কামড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। ধোঁয়া আর আগুন ছাড়ছে প্লেন, একটা মাত্র অক্ষত এঞ্জিন ফুল আরপিএম-এ ছুটছে। একই লেভেলে থেকে একটা বৃত্ত তৈরি করছে রানা, বড়সড় ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ল্যান্ড করা যায়।

ফাঁকা জায়গা এদিকে একটাই, নাম শীপ মেডো। অগুনতি মানুষ পিকনিক করতে বা গায়ে রোদ মাখতে এসেছে, সবাই তারা বুলেটে ঝাঁঝরা ট্রাইমোটরকে নেমে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত পিঁপড়ের মত চারদিকে ছুটতে শুরু করল। কারও মনে সন্দেহ নেই যে নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে ওটা।

রানাও জানে, যে-প্লেনের ওপর প্রায় কোন নিয়ন্ত্রণই নেই সেটাকে নিরাপদে ল্যান্ড করানো সম্ভব নয়। থ্রটল ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে ট্রাইমোটরকে ঘাসের দিকে খসে পড়তে দিচ্ছে ও। এছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

হাজার দুয়েক লোক রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। গোটা মাঠে কোন শব্দ নেই। প্লেনটাকে কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও সেটা ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

জমিনের কাছাকাছি এসে ট্রাইমোটর এক সেকেন্ড ইতস্তত করল। তারপর বড় হুইলগুলো নেমে এল ঘাসে। ফুটবলের মত দু'বার ড্রপ খেলো ট্রাইমোটর, শেষবার টেইল হুইলও জমিন স্পর্শ করল। সবাইকে স্বস্তি আর আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কিছু দূর গড়িয়ে স্থির হলো রূপালি ফোর্ড। দর্শকদের মধ্যে ভুলেও কেউ বিশ্বাস করেনি এটা সম্ভব।

এটাই বা কে বিশ্বাস করবে যে জ্বলন্ত প্লেনের কেবিনে বসে তৃষার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখনও গান গাইছে পনেরোজন প্রতিবন্ধী শিশু?

লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে অবশিষ্ট এঞ্জিনটাও বন্ধ করে দিল রানা, তাকিয়ে থেকে দেখল প্রপেলারের থেমে যাওয়া। চরম সংকটে সাহায্য করায় ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে খুরশিদা হকের দিকে ফিরল ও, কিন্তু তাঁকে দেখে কথা বলতে সাহস পেল না, কারণ তার মুখের সব রঙ মুছে গেছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর ঘাড়ে আঙুল ঠেকাল রানা, পালস খুঁজছে। তারপরই খসে পড়ল ওর হাত, শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

তৃষাকে ককপিটের দরজায় দেখা গেল। 'ইউ ডিড ইট!' উল্লাসে তার ফেটে পড়ার অবস্থা।

'বাচ্চাগুলো?' রানার গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

'কেউ আহত হয়নি।' তারপর কো-পাইলটের সিটের পিছনটা দেখতে পেল তৃষা, প্রায় মাপা একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছোট ছোট ফুটো—ফকারের মেশিন গান থেকে করা গুলির কাজ।

অটল পাথুরে মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে তৃষা। গম্ভীর ও নিরানন্দ চেহারা, তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল রানা। প্রথমে তৃষা মানতে চাইল না যে খুশি আন্টি বেঁচে নেই। কিন্তু নিচে তাকিয়ে ককপিটের মেঝেতে রক্ত দেখার পর কঠিন, মর্মান্তিক সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল সে।

শোক, তার সঙ্গে দিশেহারা একটা ভাব চোখে-মুখে, জানতে চাইল, 'কেন?' গলার সুরে হাহাকার। 'এরকম কেন ঘটবে? খুশি আন্টির মারা যাবার কোন কারণ ছিল না।'

প্লেনটাকে ঘিরে কয়েকশো মানুষের ভিড় জমে গেছে। আশপাশের রাস্তা থেকে পিল পিল করে আরও বহু মানুষ ছুটে আসছে কি ঘটনা জানার জন্যে। কিন্তু রানার কাছে কেউ যেন তারা দৃশ্যমান নয়, তাদের সম্মিলিত উল্লাস ও আনন্দধ্বনি যেন ওর কানে পৌঁছাচ্ছে না। তৃষাকে ও বলল, 'ওই লোকটা একা শুধু আপনার খুশি আন্টিকে খুন করেনি। আরও বহু মানুষ তার হাতে অকারণে মারা গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল তৃষা। 'এভাবে একে একে সবাইকে আমার হারাতে হবে? কেন? কেন?'

'এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে, তৃষা,' নিচু গলায়, অভয় ও সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল রানা। 'আমার ধারণা, এ-সবের পিছনে ফ্যালকন করপরেশন-এর ভূমিকা আছে।'

ষোলো

হেলিকপ্টার নিয়ে ডাক্তাররাও পৌঁছেছেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের সামান্য কাটা-ছেঁড়া পরীক্ষা করে ওষুধ-পত্র দিলেন তাঁরা। আরেক হেলিকপ্টার থেকে নামল তাদের মা-বাবা ও অভিভাবকরা, বাচ্চাদের বহাল তবিয়তে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সবাই।

শোকে কাতর ও ম্রিয়মাণ তৃষার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, খুরশিদা হকের লাশ ট্রাইমোটর থেকে বের করে একটা অ্যামবুলেন্সে তোলা হচ্ছে। প্লেনটাকে পুলিস বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার পর রানা ও তৃষাকে একটা পুলিস কারের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ওদেরকে কাছাকাছি একটা থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

তার আগে ট্রাইমোটরটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল রানা। বুলেটে ঝাঁঝরা, ক্ষতবিক্ষত ওর এই প্রিয় অ্যান্টিকটি এতগুলো মানুষকে নিয়ে কিভাবে আকাশে ভেসে ছিল, এটা খুবই বিস্ময়কর লাগছে এখন। ল্যান্ডিং হুইলের ওপর ফেন্ডারে একটা হাত রেখে বিড় বিড় করল ও, 'ধন্যবাদ।'

এরপর রানা পুলিস কারের অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, থানায় যাবার পথে বিধ্বস্ত ফকারটাকে ও একবার দেখতে পারে কিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের কারে ওদেরকে উঠতে বলল অফিসার।

লাল ফকারকে দেবদারু গাছের মাথায়, মাটি থেকে বিশ ফুট ওপরে, ছেঁড়া ও দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা ঘুড়ির মত লাগল দেখতে। ইতোমধ্যে দমকল বাহিনীর গাড়ি পৌঁছে গেছে। মই-এর ভাঁজ খুলে গাছে উঠছে একজন ফায়ারম্যান। পুলিস কার থেকে নেমে প্লেনের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল রানা। গাছের ওপর আটকে আছে ফকারের শুধু খোলসটা, মাউন্টিং থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা এঞ্জিন খসে পড়েছে নিচে, বেশ খানিকটা ডেবে গেছে নরম মাটিতে। এঞ্জিনটা দেখে চোখ কপালে উঠে যাবার অবস্থা হলো ওর। কিসের পুরানো, নয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট একশো দশ হর্সপাওয়ারের সম্পূর্ণ নতুন একটা এঞ্জিন! তারপর রানা খোলা ককপিটে তাকাল।

ককপিট খালি।

গাছটার ডালপালার ওপর চোখ বুলিয়ে মাটিতে চোখ নামাল রানা। অদূরেই ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে একটা লেদার ফ্লাইং জ্যাকেট, হেলমেট ও গগলস সহ। গগলসের লেন্সে সামান্য একটু রক্তের দাগ। পাইলটের চিহ্ন বলতে এইটুকুই।

বলা যায় প্রায় ভোজবাজির মতই গায়েব হয়ে গেছে লোকটা।

পুলিস স্টেশনে তৃষাকে অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছে, এই ফাঁকে স্থানীয় এক এয়ারক্রাফট-মেইনটেন্যান্স কোম্পানিকে ফোন করে ওর ট্রাইমোটরটাকে মেরামত করে ওয়াশিংটনের একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে বলল রানা, পুরানো গাড়ি ও এরোপ্লেনের কালেকশন যেখানে রাখে ও। তারপর নুমার চীফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে সংক্ষেপে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল।

পুলিস স্টেশনের শেরিফের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন হ্যামিলটন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, যা ঘটেছে তার একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দেবে রানা ও তৃষা, তারপরও কোন প্রশ্ন করার থাকলে নুমা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে, ব্যক্তিগতভাবে রানা বা তৃষাকে আর থানায় যেতে হবে না।

তৃষাকে নিয়ে পুলিস স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল রানা। দু'জন প্রায়

একযোগে হঠাৎ খেয়াল করল পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা। তৃষার মনে পড়ল রানাই প্রথমে তার হাত ধরেছিল। তখন সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়নি। তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তার ইচ্ছে করছে না হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। 'জানেন,' নিচু, ম্লান গলায় বলল সে, 'খুশি আন্টির এই মৃত্যু কোনদিনই আমি মেনে নিতে পারব না। মাকে হারিয়েছি দশ বছর বয়সে, খুশি আন্টির মধ্যে আমি আমার সেই মাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। বাবাও তাঁকে খুব ভাল জানতেন।'

'ডক্টর ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের। বিশেষ করে আমি চাইছিলাম, তাই বিয়ে করতেও রাজি হয়েছিলেন ওঁরা।'

'বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, তাই এতসব পারিবারিক প্রশ্ন করতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'উনি কি আপনার বাবার আবিষ্কার ও প্রজেক্ট সম্পর্কে সব কথা জানতেন?'

'সব জানতেন কিনা বলতে পারব না। বাবা তো আসলে প্রায় কাউকেই কিছু বলতে চাইতেন না। তবে খুশি আন্টি অনেক কিছুই জানতেন, কারণ বাবার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি।'

'আপনার বাবা আপনাকেও তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা দেননি কখনও?'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'কিছু জিজ্ঞেস করলে একটাই জবাব দিতেন, কোন বিজ্ঞানী বা এঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর কাজ ব্যাখ্যা করে বোঝানো অসম্ভব। নিজের কাজ সম্পর্কে মাত্র একবারই লেকচার দেন আমাকে—সেটা ওই ওয়াটার লিলিতে। তাঁর যে এঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট অনুসরণ করে জাহাজটার এঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে, সেটা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। এক রাতে ডিনারে বসে ওগুলোর ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক প্রিন্সিপল ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।'

'শুধু এই একবার? আর মাত্র এই একটা বিষয়ে?'

'লাউঞ্জে বসে কয়েক ঢোক মার্টিনি খাবার পর বাবা অবশ্য এও আমাকে বলেছিলেন যে হাজার বছরের সেরা একটা আবিষ্কার তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম একটু নেশা হওয়ায় নিজের স্বপ্নকে সত্যি বলে মনে করছেন।'

'তাহলে যা কিছু জানতেন আপনার খুশি আন্টি একাই?'

'না। ফাহিম চাচাও বাবার অনেক কথা জানেন। ওঁরা দু'জন একসঙ্গে পি.এইচ.ডি করেছিলেন। বাবা এঞ্জিনিয়ারিঙে, ফাহিম চাচা কেমিস্ট্রিতে।'

'আপনি জানেন, কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে?'

'জানি।'

'আর আপনার বাবার ল্যাবরেটরি? সেটা কোথায়?'

'জিনি টেইলর ফিল্ডের কাছাকাছি, বাড়ির সঙ্গেই ল্যাবরেটরি। ফাহিম চাচাও ওখানে থাকেন।'

'আপনার ফাহিম চাচাকে একটা ফোন করতে পারেন?'

'কোন বিশেষ কারণ?'

'ফোনে আপনি তাঁকে বলতে পারেন হাজার বছরের সেরা আবিষ্কারটা

সম্পর্কে জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে গোটা বাংলাদেশ। না, সারা দুনিয়া।

নুমা হেডকোয়ার্টারের রিশেপসন হলে টানা এক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হলো অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে। আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানী ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল হকের মৃত্যুরহস্য, ওয়াটার লিলির এঞ্জিনের ডিজাইন, ক্রুজ শিপের করুণ পরিণতি, নুমা সার্ভে শিপ হাইজ্যাক, ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সহ সেটা উদ্ধার, সিআইএ-র পরবর্তী তৎপরতা, এফবিআই-এর ভূমিকা, প্রবাসী অ্যাফ্রো-এশীয় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে নির্দিষ্ট এয়ার শোতে টেরোরিস্টের হামলা ইত্যাদি বিষয়ে ঝাঁক-ঝাঁক প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো তাঁকে।

সংবাদ সম্মেলন শেষ করে তিনি যখন নিজের আউটার অফিসে ঢুকলেন, দেখলেন ল্যারি কিং তাঁর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে।

প্রায় দশ মিনিট হলো চীফের আউটার অফিসে ঢুকেছে কিং। যে চেয়ারটায় বসেছে, তার পাশেই মেঝেতে পড়েছিল ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা। পুরানো লেদার কেসের প্রতি বিশেষ একটা দুর্বলতা আছে তার। সে ধরে নিল জিনিসটা বাতিল ভেবে কেউ ফেলে গেছে। আপন মনে হাসল কিং। ভাবল, ভালই হলো, সঙ্গের এই একগাদা কাগজ-পত্র এই কেসটায় ভরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে সে, কারণ সাধারণ ব্রিফকেসের চেয়ে এটা আকারে কিছুটা বড়, আকৃতিটাও একটু বেশি চৌকো। চীফকে ফিরতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, তার পিছু নিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরুল।

'নতুন কিছু, ল্যারি?' ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন হ্যামিলটন।

'ভাবলাম হাইজ্যাকারদের জাহাজ পানি থেকে তোলার সিআইএ প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইবেন আপনি,' বলল কিং, লেদার কেস খুলে একটা ফাইল ফোল্ডার বের করল।

চশমার ওপর দিয়ে কিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'এই ইনফরমেশন তুমি পেলে কোত্থেকে? সিআই এখনও তাদের এই ডাইভ প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছুই আমাদেরকে জানায়নি। আমি জানি কাজটা তারা শুরু করেছে—' হাতঘড়িতে চোখ বুলাবার জন্যে থামলেন—'মাত্র দশ ঘণ্টা আগে।'

'প্রজেক্ট ম্যানেজার কড়া হুকুম দিয়েছেন প্রতি ঘণ্টায় ডাটা প্রোগ্রাম মনিটর করে জানাতে হবে তাঁকে। বলতে পারেন, ওরা যখন যেটা আবিষ্কার করবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা আমরা জানতে পারব।'

'ওরা যদি জানতে পারে ভীনাস সিআই-এর সিক্রেট ফাইল হ্যাকিং করছে, আমাদের বিশ-বাইশ রকমের নরক দেখিয়ে ছাড়া হবে।'

ল্যারি কিং-এর মুখে শয়তানি হাসি। 'বিশ্বাস করুন, অ্যাডমিরাল, ওরা কখনোই কিছু জানতে পারবে না। ভীনাস ডাটা সংগ্রহ করছে স্যালভিজ জাহাজের কমপিউটর থেকে, ওগুলো ক্রিপটোগ্রামড্ অবস্থায় অ্যানালিসিসের জন্যে হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে পাঠানোর আগেই।'

এবার অ্যাডমিরালের পালা, তবে তিনি শয়তানি হাসির বদলে প্রশ্রয়দানের হাসি হাসলেন।

'আর, সার, বিশ-বাইশটা নরকের কথা যেটা বললেন, আমি জানি ওটা আপনার কৌতুক।' হাসছে কিং। 'কেউ জানে না, শুধু প্রেসিডেন্ট আর আপনি জানেন, সিআইএ বা এফবিআই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে গোপন খবরের সবচেয়ে বড় গুদাম আসলে নুমা। প্রয়োজনে আমরাই বরং ওদেরকে নরক দেখিয়ে ছাড়তে পারি।'

'বলছ কেউ জানে না, তাহলে তুমি জানলে কিভাবে?' অ্যাডমিরাল গম্ভীর।

'আমি জানি ভীনাসের কল্যাণে,' বলল কিং। 'সার, আমি এ-ও জানি যে ক্ষেত্রবিশেষে নুমার ক্ষমতা এত বেশি, স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আদেশ পর্যন্ত আমরা অমান্য করতে পারি–তাঁকে এড়িয়ে কংগ্রেসের বিশেষ একটা কমিটিকে ব্যাখ্যা করতে পারি কেন তাঁর আদেশ আমরা মানতে পারছি না।'

'এ-সব তথ্য শুধু গোপনীয় নয়, বিপজ্জনকও,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে চাকরি খোয়াতে হত, জেলও খাটতে হত।'

'আমি জানি, সার,' বলল কিং। 'তবে আপনিও জানেন এ-সব তথ্য আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে, আর কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে, বলো, কি জানতে পারল ভীনাস।'

ফাইল ফোল্ডার খুলে পড়তে শুরু করল কিং। 'হাইজ্যাকারদের ওটা একশো ত্রিশ ফুটী ক্রু/ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট, ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর টাসকান বোট ইয়ার্ডে তৈরি। ইন্দোনেশিয়ার অফশোর অয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভিস দেয়ার জন্যে ওটার ডিজাইন তৈরি করা হয়। স্পীড ও ফ্লেক্সিবিলিটি অত্যন্ত বেশি...'

'জানা গেছে কে ওটার মালিক?'

'সর্বশেষ চুক্তি ছিল বোরম্যান অয়েল কোম্পানির সঙ্গে, সলেক্সোকো-র একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি এই বোরম্যান অয়েল।'

'সলেক্সোকো,' অ্যাডমিরালের গলা থেকে প্রতিধ্বনি বেরুল। 'আমি তো জানি বিক্রি হয়ে যাবার পর সলেক্সোকো-র আর কোন অস্তিত্বই নেই।'

'কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেল থেকে ইন্দোনেশিয়ার মূল আয়টাই বন্ধ হয়ে যায়।'

'সলেক্সোকোটা কে যেন কিনে নেয়?'

চোখ তুলে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে হাসল কিং। 'সলেক্সোকো-র দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার পর ফ্যালকন করপরেশন ওটার বিলুপ্তি ঘোষণা করে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন আডমিরাল। 'খবরটা শোনার সময় নাথান করবেটের চেহারা কেমন দেখাবে?'

'সরাসরি কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না,' বলল কিং। 'বোটের মালিকানা কখনোই ট্র্যান্সফার করা হয়নি। আমাদের লাইব্রেরী চেক করে দেখা হয়েছে, উনিশশো নিরানব্বুই সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ওই বোটের কোন হদিশ নেই। আর এ-ও বিশ্বাস করা যায় না যে হাইজ্যাকাররা এমন কোন প্রমাণ রাখবে যা দেখে বোটটার সঙ্গে ফ্যালকনের সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।'

'সিআইএ এজেন্টরা হাইজ্যাকারদের কারও পরিচয় জানতে পেরেছে?'

'লাশগুলোর যে অবশিষ্ট পাওয়া গেছে, পরিচয় জানার জন্যে যথেষ্ট নয়,' বলল কিং। 'লেগুনের মুখে যে গার্ডটা পড়েছিল, তার লাশ ভাটার সঙ্গে সাগরে ভেসে গেছে। রানা যা সন্দেহ করেছে সেটাই বোধহয় ঠিক, হাইজ্যাকাররা একটা মার্সেনারি সংগঠন কোবরা ক্লাবের সদস্য। বেশিরভাগই এরা ইউএস আর্মি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ক্লাবে যোগ দিয়েছে।'

অ্যাডমিরালকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'তোমার ভীনাস এ-সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে, ফ্যালকনের মত এত বড় একটা করপরেশন পাইকারি হারে মানুষ খুন করতে গেল কেন?'

মাথা নাড়ল কিং।

'কোন থিওরিই দিতে পারছে না?'

'না, অর্থবোধক বা বোধগম্য কোন সিনারিয়ো ভীনাস তৈরি করতে পারছে না।'

'চাবি হয়তো ডক্টর সিরাজুল ইসলাম,' অনেকটা জনান্তিকে বিড় বিড় করলেন হ্যামিলটন।

'ভীনাসকে আমি ভদ্রলোকের লাইফ নিয়ে রিসার্চ করতে বলব।'

নিজের বিশাল কমপিউটর ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে কীবোর্ডের সামনে বসল কিং। ভীনাসকে ডাকল, তারপর শূন্যে তাকিয়ে বসে থাকল। ইতোমধ্যে হলোগ্র্যাফিক আদল নিয়ে উদয় হয়েছে ভীনাস, নীরবে অপেক্ষা করছে। অবশেষে এক সময় মুখ তুলে তাকাতে কনসোলের ওপর তাকে দেখতে পেল কিং।

'আমি যখন অ্যাডমিরালের কাছে ছিলাম, এরমধ্যে কিছু ঘটেছে?' জানতে চাইল সে।

'বোম্বেটে ক্রুদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি বলে রিপোর্ট দিয়েছে স্যালভিজ ডাইভাররা। কাপড় আর অস্ত্র ছাড়া কারও কাছে কিছু পাওয়া যায়নি–না মানিব্যাগ, না আইডি কার্ড, না নোটবুক। হাইজ্যাকিং-এর চার্জে যে-ই থাকুক, গোপনীয়তা রক্ষায় উঁচুদরের এক্সপার্ট লোকটা।'

'এই প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে আমি তোমাকে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের জীবনীর ওপর গবেষণা করাতে চাই।'

'উদ্ভাবক আর আবিষ্কারক ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'দেখছি সাধারণ জীবনীর বাইরে কি-কি পাওয়া যায়। তবে আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ, ভীনাস।'

কিং একঘেয়েমির শিকার। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে। স্ত্রী আর মেয়ে দুটোকে নিয়ে অনেক দিন পর বেরুবে সে, কোন রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার খেয়ে সিনেমা দেখবে। কনসোলের ফাঁকা একটা জায়গায় লেদার কেসটা রেখে খুলল সে, ভেতরে আরও কিছু ফাইল ঢোকাবে।

ল্যারি কিং সহজে চমকে ওঠার লোক নয়। ঠাণ্ডা ও শান্ত প্রকৃতির ব্লাডহাউন্ড হিসেবেই তার পরিচিতি। কিন্তু যা দেখল তাতে তার গোটা অস্তিত্ব প্রবল এক ঝাঁকি খেলো। সাবধানে, অত্যন্ত সাবধানে, লেদার কেসটার ভেতর একটা হাত ভরল সে। যে পদার্থের স্পর্শ পেল সেটা দু'আঙুলে ডলে পরীক্ষা করল।

'তেল,' আপনমনে বিড়বিড় করল কিং, হাঁ করে তাকিয়ে আছে খোলা লেদার কেসটার ভেতর। কেসটা তরল পদার্থে অর্ধেকের বেশি হবে তো কম নয় ভরে আছে। এ সম্ভব নয়, হতভম্ব হয়ে ভাবল সে। অ্যাডমিরালের অফিস থেকে বেরুবার পর কেসটা মুহূর্তের জন্যেও সে হাতছাড়া করেনি। তাহলে এই তেল এল কোত্থেকে?

সতেরো

হাডসন নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষা হাইওয়ে নাইন ধরে গাড়ি চালাচ্ছে তৃষা। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে একটা দিন; আকাশে যেমন মেঘের ছুটোছুটি আছে, মাটির কাছাকাছি তেমনি দমকা বাতাসের দাপাদাপি চলছে। ভেজা পেভমেন্টে জাগুয়ার এক্সকে-আর হার্ডটপ স্পোর্টস কারটা সাবলীল ভঙ্গিতে চালাচ্ছে তৃষা। হুডের নিচে তিনশো সত্তর হর্সপাওয়ারের সুপারচার্জড্ একটা এঞ্জিন আর চেসিসের নিচে কমপিউটর-অ্যাকটিভেটেড সাসপেনসন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং কন্ট্রোল থাকায় কোন রকম ইতস্তত না করে মনের সাধ মিটিয়ে স্পীড তুলছে সে।

নরম লেদারের প্যাসেঞ্জার সিটে গা এলিয়ে দিয়ে ড্রাইভটা উপভোগ করছে রানা, চোখের দৃষ্টি মাঝে-মধ্যে বাঁ দিকে সরে গিয়ে দেখে নিচ্ছে স্পীডোমিটারের কাঁটা। গাড়ি চালানোয় তৃষার দক্ষতার ওপর আস্থা রাখতে চায় ও, তবে পরিচয়টা মাত্র কয়েক দিনের হওয়ায় জানা নেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কেমন চালাবে সে। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, রোববার সকাল বলে রাস্তায় গাড়ি খুব কম দেখা যাচ্ছে। পেশি ঢিল করে দিয়ে রাস্তার দু'পাশের খেত-খামার, মাঠ, বাগান আর বনভূমি দেখছে ও। বনভূমির গাছগুলো এত উঁচু, পিছনের পাথুরে পাহাড় পর্যন্ত বেশিরভাগ আড়াল করে রেখেছে।

এক সময় বাঁ দিকে বাঁক নিল তৃষা। এখান থেকে আবাসিক এলাকা শুরু। বাড়িগুলো যেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীর তুলির আঁচড়ে সাজানো। প্রতিটি বাড়ির সামনে সযত্নলালিত ফুলবাগান আর সবুজ মখমলের মত লন। রাস্তাটা সাপের মত এঁকেবেঁকে বেশ কিছু দূর এগিয়েছে। অবশেষে একটা গেটের সামনে থামল তৃষা। গেটটা মাঝখানে কাটা। মূল শহর থেকে এতটা দূরে, প্রায় গ্রামীণ একটা পরিবেশে ঠিক এ-ধরনের সিকিউরিটি কেউ আশা করবে না। গেট থেকে ভেতর দিকে প্রসারিত চওড়া পাঁচিল দুটো দশ ফুট উঁচু। গেটটা অস্বাভাবিক পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি, ফুলস্পীডে ছুটে আসা সীসা ভর্তি যে-কোন পাঁচটনী ট্রাককেও একদম ঠেকিয়ে দিতে পারবে। রাস্তার ওপারে, গেট থেকে বিশ গজ

দূরে, উঁচু একজোড়া পোলের মাথায় ফিট করা হয়েছে দুটো টেলিভিশন ক্যামেরা। ওগুলোকে অকেজো করতে হলে দরকার লক্ষ্যভেদী রাইফেলের বুলেট।

তৃষা গাড়ি থামিয়েছে একটা পাথুরে পিলারের পাশে। বাক্সটাকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, দেখে মনে হলো পাথরের ভেতর গাঁথা। বাক্সের গায়ে বোতাম রয়েছে। গাড়ির জানালা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকে কয়েকটা বোতামে চাপ দিল তৃষা। রিমোট কন্ট্রোলটা এতক্ষণে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল সে, চাপ দিল আরেকটা কোড-এ। এবার ধীরে ধীরে মাঝখান থেকে ফাঁক হতে শুরু করল গেট। জাগুয়ার ভেতরে ঢুকতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সেটা, পিছু নিয়ে অন্য কোন গাড়ি যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

'সিকিউরিটি সম্পর্কে আপনার বাবা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন,' মন্তব্য করল রানা।

'সবটুকু এখনও আপনি দেখেননি। চোখে পড়ছে না, তবে চারজন গার্ডও আছে।'

রাস্তাটা গম, আখ, সূর্যমুখী ইত্যাদি খেতের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে। এটা আসলে একটা খামারবাড়িই। আঙুর বাগানের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে জাগুয়ার, হঠাৎ বড়সড় একটা ব্যারিকেড মাথাচাড়া দিল গাড়ির সামনে। বাধাটা সম্পর্কে জানত তৃষা, তাই আগে থেকেই স্পীড কমিয়ে আনছিল।

গাড়ি থামামাত্র মোটাসোটা একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে মাঝারী আকৃতির এক লোক বেরিয়ে এল, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। ঝুঁকে গাড়ির ভেতরটা দেখল সে। চেহারাই বলে দিচ্ছে লোকটা নেপালী। সম্ভবত অবসর নেয়া গুর্খা সৈনিক, ধারণা করল রানা।

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তৃষাকে করজোড়ে নমস্কার করল লোকটা। 'নমস্তে, মাঈজী,' ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে কথা বলছে সে। 'আপনাকে দেখলেই আনন্দে আমার বুকটা ভরে ওঠে।'

'কেমন আছ, প্রভাস কাকা? তোমার ছোট্ট খুকি মনীষা কেমন আছে?'

'আমরা তাকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়েছি।'

'ভালই করেছ।' হাত তুলে গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠামো দেখাল তৃষা, খানিক চেষ্টা করার পর আন্দাজ করা গেল যে ওটা একটা বাড়ি। 'ফাহিম চাচা কি এখানে?'

'জ্বী, মাঈজী,' জবাব দিল গুর্খা গার্ড প্রভাস। 'আপনার পিতাজী মারা যাবার পর খামারবাড়ি ছেড়ে কোথাও তিনি যাননি।' নিজের বুকে একটা আঙুল রাখল সে। 'বড় চোট পেয়েছি, মাঈজী। মনিবজী আমার দেওতা ছিলেন।'

'ধন্যবাদ, প্রভাস কাকা।' রানার দিকে ফিরল তৃষা, ফিসফিস করে বলল। 'ওর নাম শেরপা প্রভাস থাপা, বাবা ওকে ব্রিটেন থেকে নিয়ে এসে গার্ডের চাকরি দিয়েছিলেন। গুর্খা রেজিমেন্টে ছিল ও। এখানকার সব গার্ডই নেপালী।'

'ভাল থাকুন, মাঈজী,' বলার পর প্রায় ভোজবাজির মত জঙ্গলে মিলিয়ে গেল প্রভাস থাপা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তৃষার দিকে তাকাল রানা। 'হাত-পা বেঁধে মেয়েকে নদীতে